...জগদ্ধিতায় চ

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ''ঋষিদের ধর্ম সনাতন ধর্ম, অনন্তকাল আছে ও থাকবে।... অন্যান্য যে-সব ধর্ম আধুনিক ধর্ম কিছুদিন থাকবে আবার যাবে।''[১] এর কারণ সনাতন ধর্ম সর্বগ্রাসী, জগতের অধ্যাত্মপথে যত ভাব আছে তাকে আলিঙ্গন করতে তার অসুবিধে নেই। বেদান্তে অদ্বৈত-দ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত যেমন আছে, তেমন এ-তিনের মাঝে দ্বৈতাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদ, শাক্তাদ্বৈত ইত্যাদি সকলেরই ঠাঁই আছে। সে-কারণে সহজেই সর্বজনীন হয়ে উঠতে তার বাধা নেই। আর এর চরম উদ্দেশ্য যেহেতু মোক্ষ, তাই যতরকম ভাব আছে সেগুলি সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথ—এই হিসাবে সবগুলির মান্যতা দেয় এই ধর্ম। শুধু প্রয়োগপদ্ধতিতে সে একান্তে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে পথ চলার স্বীকৃতি দেয়। সেখানে দল বেঁধে চলার সুযোগ নেই। হয়তো তাই সনাতন ধর্মে আশ্রম থাকলেও ধর্মীয় সঙ্ঘ কখনও দেখা যায়নি। ভারতে ধর্মীয় সঙ্ঘ বৌদ্ধদের দান। কারণ বৌদ্ধধর্ম প্রচারশীল ধর্ম যা সনাতন ধর্ম কোনওদিনই ছিল না। প্রচারশীল সে-ই হয় যার অপরকে খণ্ডন করে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সনাতন ধর্মের তা প্রয়োজন নেই, কারণ সে সব মতকেই আত্মসাৎ করে বসে আছে। তবু এই সনাতন ধর্মের বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের নামে সঙ্ঘ সৃষ্টি হয়েছে আর সে-সৃষ্টির মুখ্য কারিগর স্বামী বিবেকানন্দ। এর পেছনে কী কী ভাবনা কাজ করে থাকতে পারে সেটিই আমরা সাধ্যমতো বোঝবার চেষ্টা করি।

ভারতের ঘোর তমসার দিগন্তে সূর্যোদয়ের ক্ষীণ আভাস দেখা গিয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ অসুখের সময় কাশীপুরে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় সেটি অরুণোদয়, যার পরেই অভীষ্টলাভের নিশ্চয়তা। নরেন্দ্রনাথ তাঁর মনোগত বাসনা প্রকাশ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে—তিনি সমাধিতে ডুবে থাকতে চান, শুধু মাঝে মাঝে শরীর রক্ষার জন্য নিচে নামবেন এবং আহারান্তে আবার সমাধিতে ডুবে যাবেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সমর্থন তো পেলেনই না বরং ধিক্কৃত হলেন। শুধু নিজে আমটি খেয়ে মুখ মুছে ফেলা! পাঁচিলের ওপারে মহা আনন্দের জায়গার খবর কাউকে না দিয়ে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়া! কুয়ো খুঁড়ে ঝুড়ি-কোদাল অপরের জন্য তুলে না রেখে কুয়োতেই বিসর্জন দেওয়া! শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ''তুই তো বড় হীনবুদ্ধি! ও অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে। তুই তো গান গাস—যো কুছ হ্যাঁয় সো তুঁহী হ্যাঁয়''।[২] পাকা

খেলোয়াড় পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে আবার খেলে, ভয়তরাসেরা কেবল নিজের মুক্তি খোঁজে। নরেন্দ্রনাথ শুনলেন তাঁকে বিশাল বটগাছের মতো হতে হবে, যে-গাছের ছায়ায় শত শত দুঃখী, আর্ত আশ্রয় পাবে, জীবনের অর্থ খুঁজে পাবে। তার জন্য তৈরি হতে হবে তাঁকে। এই হয়ে ওঠার পথের কয়েকটি সূত্র দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—'খালি পেটে ধর্ম হয় না', 'ভোগান্ত না হলে মন ঈশ্বরের দিকে যায় না', 'চোখ বুজলেই তিনি আছেন আর চোখ খুললে কি তিনি নেই?' 'জীবই শিব, তার সেবা ঈশ্বরেরই সেবা ইত্যাদি।' নির্বাণপন্থী বৌদ্ধসঙ্ঘের যতিরা মানুষের সেবা করেছেন করুণার প্রেরণায় কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের যোগদান ছিল না। স্বামীজী বুঝলেন সেই ভাবের সঙ্গে একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে এবার। জীবকে জীব হিসাবে না দেখে তাকে শিবরূপে দেখে যে-সেবা তা পূজারই নামান্তর, আর সে-পূজায় সকলেরই অধিকার। আরও শুনলেন, যে-নির্বিকল্প সমাধির আস্বাদন তিনি করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায়, তার দরজা তিনিই তালা বন্ধ করে রেখেছেন, আর সে-তালা খুলবে শ্রীরামকৃষ্ণরূপী মায়ের আরব্ধ কাজ শেষ হলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনের প্রাণে তাঁর ভাবের আগুন জ্বেলে দিয়েছিলেন। সেই দাহ নিয়ে নরেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারত পায়ে হেঁটে ঘুরতে লাগলেন। অতি দরিদ্রের পর্ণকুটির থেকে রাজা-মহারাজার প্রাসাদ, সরল মূর্খ মানুষ থেকে মহাপণ্ডিতের অহংকারী বৈঠকখানা, কিছুই বাকি রাখলেন না। দেখলেন বিশ্ববাসীকে অমৃতের পুত্র ঘোষণা করা সেই ঋষিকুলের বংশধরদের অশিক্ষা, কুসংস্কার, ভেদবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন অবস্থাকে। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? এ-তামসিকতায় আচ্ছন্ন নিদ্রিত জাতিকে জাগিয়ে তোলা এক অসম্ভব স্বপ্ন! কিন্তু নরেন্দ্রের মূলধন শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে অসীম বিশ্বাস। যদি এটি তাঁর কাজ হয়ে থাকে তাহলে তা ঈশ্বরের কাজ, আর সে-কাজে একটা পথ পাওয়া যাবেই। এই জেদ তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল। তখন ভারত অসংখ্য সামন্তরাজ্যে বিভক্ত। পূর্ববর্তী অবতারের সময়ে যা হয়েছে, অর্থাৎ সমাজের মাথা হিসাবে ব্রাহ্মণ ও রাজন্যবর্গের মনে কোনও তত্ত্ব ঢোকাতে পারলে তা সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ত, কারণ প্রজাকুলের ওপর তাঁদের প্রভাব অসীম এবং তাঁদের হাতেই প্রজাকল্যাণের ক্ষমতা। কিন্তু ব্রিটিশ-তোষণলব্ধ রাজ্যের রাজাদের প্রজাদের উন্নতি করার দায় নেই। তাছাড়া সে-পথে চললে, প্রজারা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠলে, ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরাগভাজন হওয়ার খুব সম্ভাবনা। অতএব তাদের মধ্যে স্বামীজীর ভাব আদৃত হলেও বাস্তব প্রয়োগ তাদের থেকে দূরেই রইল। এই অসাফল্যে দমে যাওয়ার পাত্র নন স্বামী বিবেকানন্দ। তাই একদিন উত্তাল সাগর সাঁতরে কন্যাকুমারীর দক্ষিণে এক দ্বীপে গিয়ে উঠলেন তিনি। চলল ধ্যান তিনদিন, তিনরাত ধরে। বেরোল পথ, কিন্তু তা কার্যকরী করা বড় কঠিন। ইতিমধ্যে খবর এল আমেরিকায় এক বিশাল ধর্মসম্মেলন হচ্ছে। তাঁর মনে হল পাশ্চাত্যে তাঁর ভাব আদৃত হলে তা শতগুণে ফিরে এসে দেশের মানুষকে উজ্জীবিত করবে। তাদের সংস্কৃতি, ধর্ম যে তুচ্ছ নয়, তাদেরও বিশ্বকে কিছু দেওয়ার আছে—এই জ্ঞান হলে তাদের হারানো মনুষ্যত্ব ও আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে।

কিন্তু আমেরিকায় পৌঁছে অপরিসীম বাধার সম্মুখীন হলেন স্বামীজী। শীত, অর্থাভাব, অপরিচয়ের অবজ্ঞা, কিন্তু অদম্য জেদ মনে। সম্মেলনের আগে-আগে (২০ আগস্ট ১৮৯৩) আলাসিঙ্গাকে লিখলেন, ''এত চেষ্টার পর আমি সহজে ছাড়িতেছি না। তোমরা কেবল যতটা পারো, আমায় সাহায্য কর। আর যদি তোমরা নাই পারো, আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখিব। আর যদিই

আমি এখানে রোগে, শীতে, বা অনাহারে মরিয়া যাই, তোমরা এই ব্রত লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে।" আরও লিখলেন, ''পথ ভীষণ কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু পার্থসারথি আমাদের সারথি হইতেও প্রস্তুত, তাহা আমরা জানি। তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের শতশতযুগসঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।"[৩] এই অনন্ত বিশ্বাসের ফলস্বরূপ পরবর্তী ঘটনা আমরা সবাই জানি। ধর্মসম্মেলনের উদ্দেশ্য অন্য থাকলেও তার মধ্য দিয়ে বিশ্ব পেল বেদান্তের অমোঘ বাণী। প্রথম দিনের বক্তৃতাতেই বিশ্বজয়ের সূচনা হল। ভারতে সে-খবর পৌঁছলে ভারতের মানুষ যেন পাগল হয়ে উঠল স্বামীজীকে নিয়ে।

কিন্তু আবেগের স্থায়িত্ব বড় কম হয়, তাকে ধরে রাখতে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা দরকার। প্রদীপকে জ্বালিয়ে রাখতে তেলের জোগান চাই। স্বামীজী জানতেন সংস্কারবাদীরা সমাজের সমস্ত দোষের দায় আমাদের ধর্মের ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে নষ্ট করে দিতে চান, এবং পাশ্চাত্যমুখী হতে পারলেই আমাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী এই ধারণায় বিশ্বাস করেন। মানুষের পক্ষে ধর্ম তার শরীরের মতো। এই শরীরের যথাযোগ্য ব্যবহারে ঈশ্বরলাভ হয় আবার তার অপব্যবহারে তা শোষণের যন্ত্র হয়ে ওঠে। আধ্যাত্মিকতার ধর্ম তো অনেক দূরের কথা, আগে মানবধর্ম পালিত হোক। 'খালিপেটে ধর্ম হয় না'—যে-মানুষ শুধুমাত্র উদরপূর্তির জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করেও অর্ধাহারে থাকে তাকে মোক্ষের কথা বলা অর্থহীন। আবার যারা ভোগসমুদ্রে ডুবে আছে তারা 'পাথরের দেওয়াল', তাতে 'পেরেক ঠুকতে গেলে পেরেকের মাথা ভেঙে যায়' অর্থাৎ 'ভোগান্ত না হলে ঈশ্বরে মন হয় না'। এদের মাঝামাঝি যারা আছে তারাই ভরসা, কারণ তারাই ধর্মের সামান্য যেটুকু অবশেষ তাকে ধরে রেখেছে। কিন্তু বহুযুগের জড়তায় তারা উদ্যমহীন, এমনকী কোনও পরিবর্তনেও বিশ্বাসী নয়। বাকি রইল একটাই দল। স্বামীজী ১৯ মার্চ ১৮৯৪ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখছেন, ''দাদা, এইসব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comorin মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি।...

''মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কোন্ কাজ করে?—তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী—গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe ইত্যাদির সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না। এ সমস্ত প্ল্যান আমি এইটুকু চিঠিতে লিখতে পারি না।... এদেশে spirituality নাই, এদের spirituality দিচ্ছি, এরা আমায় পয়সা দিচ্ছে। কতদিনে সিদ্ধকাম হবো জানি না... নিজে প্রাণপণ করে রোজগার করে নিজের plans carry out করব or die in the attempt...

''তোমরা হয়তো মনে করতে পার, কি Utopian nonsense, you little know what is in me। আমাদের ভেতর যদি কেউ আমার সহায়তা করে in my plan—all right খুব উত্তম; নইলে কিন্তু গুরুদেব will show me the way out।"[৪]

এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যা সফল করতে জীবনপণ। দীর্ঘ চার বছর বেদান্ত প্রচার ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ ভক্ত রেখে ভারতে ফিরলেন স্বামীজী। দেশের মানুষের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বন্যা সামলিয়ে মন দিলেন এক যন্ত্র উদ্ভাবনের কাজে, যা একবার চালু হলে চলবার শক্তি নিজের মধ্য থেকেই সংগ্রহ করে নেবে। ১ মে ১৮৯৭—এক সভা আহূত হল

বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে। স্বামীজী উপস্থিত গৃহী ভক্ত ও সন্ন্যাসীদের বললেন, ''নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না। তবে আমাদের মতো দেশে প্রথম হতে সাধারণতন্ত্রে সঙ্ঘ তৈরি করা, বা সাধারণের সম্মতি (ভোট) নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধাজনক বলে মনে হয় না।... এদেশে শিক্ষাবিস্তারে যখন ইতরসাধারণ লোক সমধিক সহৃদয় হবে, যখন মত-ফতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাইরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখবে, তখন সাধারণতন্ত্রমতে সঙ্ঘের কার্য চালাতে পারবে। সেইজন্য এই সঙ্ঘের একজন director বা প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। তারপর কালে সকলের মত লয়ে কার্য করা হবে।"[৫] শুরু হল রামকৃষ্ণ মিশন নামে এক সঙ্ঘ। যার উদ্দেশ্য হল ''মানবের হিতার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কার্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রচার এবং মানুষের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করা।"[৬] স্বামীজী তাকে একটি মন্ত্রে বেঁধে দিলেন : 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'।

কিন্তু এসব কি সন্ন্যাসীদের কাজ? এক বড় প্রশ্নচিহ্ন গুরুভাইদের মনে। তাঁরা ঘরবাড়ি সব ছেড়েছেন কি আবার কর্মে জড়িয়ে পড়বেন বলে? স্বামী যোগানন্দ তো বলেই উঠলেন : ''তোমার এসব বিদেশী ভাবে কার্য করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল?" স্বামীজী একথা শুনে উত্তেজিত। বললেন, ''তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।"[৭] স্বামীজীর মনের অবস্থা তখন—''এসেছ একান্ত কাছে ছাড়ি দেশকাল/ হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙ্গি অন্তরাল।/ তোমারই নয়নে আজ দেখিতেছি সব, /তোমারই বেদনা বিশ্বে করি অনুভব।/তোমার অদৃশ্য হাত হেরি মোর কাজে/ তোমারই কামনা মোর কামনার মাঝে।" যোগানন্দজী বললেন, ''ঠাকুর যে তোমার ভেতর দিয়ে এ-সকল করছেন, মাঝে মাঝে তা বেশ দেখতে পাচ্ছি। তবু কি জান, মধ্যে মধ্যে কেমন খট্‌কা লাগে—ঠাকুরের কার্যপ্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কিনা!" সত্যিই স্বামীজীকে তখন বুঝতে পারা মুশকিল ছিল। আবার ঠাকুরকে সবাই যেভাবে বুঝতেন তাতে এই কর্মের ধারাকে তাঁর উপদেশের সঙ্গে মেলানোও মুশকিল ছিল। তাছাড়া এই কর্মের দ্বারা প্রবল কুসংস্কার ও ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন সমাজকে উদারচিন্তা ও স্বচ্ছদৃষ্টিতে ফেরানো যাবে কি না তাও অনিশ্চিত। অনেকেই তো চেষ্টা করছেন এবং এখনও করছেন, কিন্তু কিছু পরিবর্তন হয়েছে কি? জগতের মঙ্গল করা রূপ এই ভাবনার বিরুদ্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ পরিষ্কার। ''তোমরা বল 'জগতের উপকার করা।' জগৎ কি এতটুকু গা! আর তুমি কে, যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার কর। তাঁকে লাভ কর। তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত করতে পার। নচেৎ নয়।"[৮] এ ধরনের কথা অনেকবার বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বলেছেন, আগে ঈশ্বর তারপরে জগৎ, রাম শব্দে রা মানে ঈশ্বর ম মানে জগৎ। কথামৃতকার শ্রীম বিভিন্ন দিনে শ্রীরামকৃষ্ণের বলা এই কথাগুলি একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। শ্রীম নিজেও কখনও সাধনপথের সঙ্গে 'জগদ্ধিতায়' শব্দটির উপযোগিতা মেনে নিতে পারেননি। কাশীতে সেবাশ্রমে শ্রীমাসারদা দেবী সব দেখে বলেছিলেন, ''দেখলুম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন—তাই এসব কাজ হচ্ছে। এসব তাঁরই কাজ।"[৯] মাস্টারমশাইকে কথাটি শোনানো হলে তিনি বললেন, ''আর অস্বীকার করবার জো নেই।" কিন্তু একথা বললেও আমরা

পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজীর কাছে শুনেছি যে তিনি শেষ পর্যন্ত এতে আস্থা রাখতে পারেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের বাইরের সন্ন্যাসীদের মনে যে এতে আস্থা ছিল না তা বলাই বাহুল্য। সন্ন্যাস মানেই কর্মসন্ন্যাস। মূলত শংকরাচার্য অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা ও সন্ন্যাস আশ্রমের সংস্কার করার পরে এই জগতকে মায়া আরোপিত বলে গ্রহণ করার ধারা তৈরি হল। এটি হয়তো অনধিকারীকে স্বার্থপর হওয়ার ইন্ধন জুগিয়েছিল। জগৎ যখন মায়ার খেলা তখন তার জন্য স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন কোথায়, এই সুবিধাবাদী চিন্তা অপরের দুঃখের প্রতি উদাসীন থাকার সুযোগ এনে দিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজ ঠিক এর সংস্কারে ব্রতী না হলেও এ-বিষয়ে সচেতনতায় উদ্যোগী হয়েছিল, কিন্তু তা হয়েছিল খ্রিস্টীয় পদ্ধতিতে। ব্রাহ্মধর্ম উপনিষদ থেকে নেওয়া হলেও আচরণগতভাবে তা খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিল। সেই স্বর্গস্থ পিতার আদলে 'পিতা নোঽসি'—তুমি আমাদের পিতা; সাপ্তাহিক উপাসনা, সারমনের ভঙ্গিতে বেদি থেকে আচার্যের উপদেশ ইত্যাদির মাধ্যমে একটা নৈতিক জীবনযাপনই ধার্মিকতা বলে স্বীকৃত ছিল। খ্রিস্টীয় ধর্মের হিতকর কর্মে যে-স্বর্গরাজ্যের হাতছানি, হিন্দুদের পুণ্যকর্মে স্বর্গলাভের যে-বিধান, তা মিলিয়ে জগতের উপকার করা আদর্শ হিসাবে গৃহীত ছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ঈশ্বরে ভক্তিলাভ—যার জন্য এই মনুষ্যজন্ম, তার কাছে এই ভাব অতি তুচ্ছ। কথামৃতে উল্লিখিত কথাগুলি প্রধানত ব্রাহ্ম ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলা। তাদের ছিল সংসারে ধর্ম, ধর্মের সংসার নয়। সংসারে আর পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে নৈতিক ধর্মের সংযুক্তি। একবার এক ব্রাহ্ম ভক্ত দয়াধর্মের কথা তুললে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্লেষভরে বলেন, ''আর দান-ধ্যান-দয়া কত! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার টাকা খরচ—আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দুটি চাল দিতে কষ্ট হয়—অনেক হিসেব করে দিতে হয়। খেতে পাচ্ছে না লোকে,—তা আর কি হবে, ও শালারা মরুক আর বাঁচুক, —আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভাল থাকলেই হল। মুখে বলে সর্বজীবে দয়া।''[১০] কোনও কিছু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দয়াধর্ম আর প্রাণের টানে লোকের দুঃখে সাড়া দেওয়ার তফাত তারা বুঝতে পারেনি। শম্ভু মল্লিকের স্কুল-হাসপাতাল করে দেওয়ার কথায় যে-প্রচ্ছন্ন অহংকার, তা নাশ করার উদ্দেশ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি, ''যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি বলবে কতকগুলো হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি করে দাও? ভক্ত কখনও তা বলে না বরং বলবে, 'ঠাকুর! আমায় পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্বদা রাখ, পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও।' ''[১১] গুরুত্ব কোথায় দিতে হবে এটি বোঝানোর জন্যই বলা—আগে ঈশ্বরলাভ করে তারপর জগতের হিত করা যেতে পারে। ''আগে জো-সো করে, ধাক্কাধুক্কি খেয়েও কালীদর্শন করতে হয়, তারপর দান যত কর, আর না কর।''[১২]

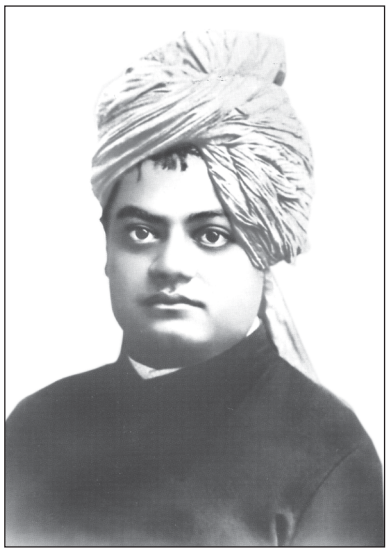

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যে এটিও বললেন, ''চক্ষু বুজলে ঈশ্বর আছেন, আর চক্ষু খুললে কি ঈশ্বর নাই?'' অথবা ''কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—

শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!”[১৩] তার কী হবে? জীবে দয়া করা আর তাকে শিবজ্ঞানে সেবা করার মধ্যে পার্থক্য অনেক। গীতায় ‘যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি’ এর প্রায়োগিক রূপ। তবে একথাগুলি তিনি কখনও কখনও সূত্রাকারে বলেছেন, আর ‘পড়ল কথা ঘরের মাঝে যার কথা তার প্রাণে বাজে’, অতএব কথাগুলি নরেন্দ্রনাথের প্রাণে বাজত। অবশ্য কথাগুলি তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়াল সমগ্র ভারত ঘুরে তার হীনদশা দেখার পর।

স্বামীজীর উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র হল দ্বিমুখী। জীবনের উদ্দেশ্য সাধু-গৃহস্থ-নির্বিশেষে ‘আত্মনো মোক্ষার্থং’, কিন্তু তা জগতের কল্যাণের দ্বারা বা ‘জগদ্ধিতেন’ নয়, তাহলে মুক্তির পথকে গণ্ডিবদ্ধ করে দেওয়া হবে, তাই যুক্ত হল—‘এবং জগতের হিত’—‘জগদ্ধিতায় চ’। আর জগতের হিত তখনই হবে যখন ভারত হীনদশা থেকে মুক্তি পেয়ে তার অধ্যাত্মসম্পদ জগতকে বিলোতে পারবে। কিন্তু এ-কাজ সন্ন্যাসীদের কাঁধে চাপানো হল কেন? অধ্যাত্মসম্পদের পুনরুদ্ধার সন্ন্যাসীদের কাজ অবশ্যই, কিন্তু ভারতের জনগণকে হীনদশা থেকে উত্থানের কাজ সন্ন্যাসীদের কী করে হতে পারে? এটি অতি সুন্দরভাবে পুজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী কনখলে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত সাধুসমাজকে একটি গল্পের মাধ্যমে বলেছিলেন।

শিল্প-সাম্রাজ্যের অধিকারী এক ভদ্রলোক তাঁর কাছে আসতেন। ভারি ভক্ত। একবার এসে মহারাজের কাছে বলেন যে, তাঁর সাম্রাজ্যের পরিচালন ভার ছেলেদের হাতে দিয়ে তিনি বানপ্রস্থী হয়ে বাকি জীবন কাটাবেন স্থির করেছেন। মহারাজের উপদেশ গ্রহণ করে তিনি সংসার ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু কয়েক বছর বাদে ছেলেরা তাঁকে সংবাদ পাঠাল যে তাদের কিছু ভুলভ্রান্তিতে ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ, এখন তিনি যদি ফিরে এসে একটু সামলে দিয়ে যান তাহলে তারা উপকৃত হবে। ভদ্রলোক মহারাজের অনুমতি নিয়ে ফিরলেন এবং যথোচিত ব্যবস্থা করে আবার ফিরে গেলেন। আজকের সমাজের অবস্থাও এমনই। ভোগসুখে বিপথগামী সমাজ দিগ্‌ভ্রষ্ট এবং তাকে যথার্থ দিশা দেখাতে সাধুসমাজই সক্ষম। এতে যেমন সমাজ বাঁচবে তেমনই উন্নত সমাজ থেকে উন্নতমনা মানুষ সৃষ্টি হয়ে সাধুসমাজকে পুষ্ট করবে। স্বামীজীর এই সঙ্ঘের স্বয়ংক্রিয় চালিকাশক্তির ভিত্তিও এটিই। এই ভাবনা এক অভূতপূর্ব উদ্ভাবন, যার প্রভাব আজ ক্রমশ দেখা যাচ্ছে।

এই সঙ্ঘের আর একটি পরিচয় স্বামীজী নির্ধারণ করেছেন যে, এটি একটি ‘অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়’। শ্রীরামকৃষ্ণকে বলা হয়েছে ‘সিদ্ধসর্ব-সম্প্রদায়-সম্প্রদায়বর্জিতম্’ অর্থাৎ যিনি সকল সম্প্রদায়-বিহিত সাধনে সিদ্ধ অথচ কোনও সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন। কিন্তু এ-সঙ্ঘ সম্প্রদায় তো বটে, তাই অসাম্প্রদায়িক কী করে হবে! এই সঙ্ঘ মুখ্যরূপে সন্ন্যাসী ও সেইসঙ্গে গৃহী ভক্তদের সম্মিলিত সঙ্ঘ, যা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগীদের সঙ্ঘ। কিন্তু এই কথাটিতেও সম্প্রদায়ের স্পর্শ থেকে যায়। তাহলে কি সকলকেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী হতে হবে? অবশ্যই নয়, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের মধ্যে জগতের সব অধ্যাত্মভাবই অন্তর্ভুক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব—নিজের ভাব বা অধ্যাত্মপথ বদলাবার প্রয়োজন নেই, শুধু সেই পথে বিশ্বাস রেখে ঈশ্বরলাভের আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে এবং তাতেই সিদ্ধি অনিবার্য। এই আকাশবৎ উদারতার দৃষ্টি যিনি গ্রহণ করবেন তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে ভাবান্বিত, তাতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম করুন বা না-ই করুন। তাই স্বামীজী বললেন, সম্প্রদায় গঠনের যে-সুবিধা সেটি থাকবে কিন্তু সম্প্রদায়ের যে-সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তা থাকবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ কী করে হবে? সেটিও হবে

জীবাত্মার মুক্তির সঙ্গে জগতের হিতকর্মের যোগসাধন ঘটিয়ে। যেহেতু জগৎছাড়া কেউ নয়, তাই জগতের হিতে নিজেকে নিয়োজিত করলে কাউকে বাদ দেওয়া চলে না। মনুষ্যেতর জীব সমেত সমগ্র জীবকুল, সেইসঙ্গে সুস্থ পরিবেশভাবনা, কল্যাণমূলক বিজ্ঞানচিন্তা, আর্থিক উন্নতি—কিছুই বাদ যায় না। সুতরাং এই সম্প্রদায় জগতের ধর্মীয়, জাতিগত, সংস্কৃতিগত, শিক্ষাগত বিভিন্ন বিষয়ে জনসমাজের সামগ্রিক হিতকর্মে নিয়োজিত।

কিন্তু মুক্তিকামী মানুষের এই কর্মে কী লাভ? কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের বিরোধ, আর জ্ঞান না হলে মুক্তি হয় না। মুক্তিতে মানুষের ক্ষুদ্র সত্তাটি বিরাট সত্তার সঙ্গে মিশে যায়। তার পথ দুটি। প্রথমটি, নিজের ক্ষুদ্র সত্তাকে জগদতীত সত্তার সঙ্গে মেলানোর পথে জগতকে বাদ দিয়ে তার স্বরূপে নিজেকে একীভূত করা। কিন্তু সে-পথ সম্পর্কে গীতা বলেছেন, 'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত-চেতসাম্'—নিরালম্ব হয়ে অব্যক্তের সাধনা অত্যন্ত কঠিন, কারণ 'অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে'—দেহবোধ থাকলে এ-সাধনা গভীর দুঃখদায়ক। তাই এ-পথের যথার্থ পথিক বিরল। দ্বিতীয় পথটি, এই জগতের মধ্য দিয়েই সেই জগদতীত সত্তায় পৌঁছনো। এই দৃশ্যজগৎ যা সেই বিরাট সত্তারই প্রকাশ, তার অসীমতায় নিজের সত্তার নিমজ্জন। তার পথটি ভালবাসার মধ্য দিয়ে এই জগতকে আপনার করে নেওয়া, জগতের সবকিছুর মধ্যেই সেই প্রেমাস্পদের প্রকাশ এই বিশ্বাসে। ''জগতকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয় মা জগৎ তোমার।''—মায়ের এই অন্তিম বাণীই আমাদের জানিয়ে দেয় যে জগতের হিতকল্পে কর্মের সঙ্গে আত্মমুক্তিরও যোগ আছে। ''তিনি বিভুরূপে সর্বত্র আছেন... জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা''—শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। আরও বলছেন ''পরের উপকারে নিজেরই উপকার।'' এই লোকহিতায় কর্মের দ্বারা ক্ষুদ্র জীবচৈতন্য থেকে সমূহচৈতন্যের দিকে যাত্রা। এ-জগৎ ঈশ্বরেরই বিশেষ প্রকাশ বোধে কর্ম তাঁর সঙ্গে যুক্ত রাখে। ''যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ''—ঈশ্বরার্থে কর্ম ছাড়া সব কর্মই বন্ধনের কারণ। স্বামীজী যে বলেছিলেন, ঘুরে ঘুরে ভিক্ষায় উদরপূর্তি করে সন্ন্যাসীরা কী করছে?—তার কারণ তিনি দেখেছিলেন কর্মত্যাগ করে গেরুয়া পরে বেশির ভাগ সাধু তামসিকতায় ডুবে আছে। 'ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে'—কর্ম না করে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ হয় না।

এই সঙ্ঘের আর একটি বৈশিষ্ট্য, এখানে চারটি যোগই সমন্বিত। সন্ন্যাসী তাঁর মহাবাক্য স্মরণ মননে জ্ঞানযোগী, এ-সমগ্র জগৎ ব্রহ্মের বিশেষ প্রকাশবোধে সর্বভূতের সেবায় তিনি কর্মযোগী, প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যানে তিনি রাজযোগী আবার শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা, তাঁর কাছে প্রার্থনা আত্মনিবেদনে তিনি ভক্তিযোগী। একইভাবে তিনি অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আবার দ্বৈতবাদী। স্বামীজীর উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত যন্ত্রটির কল্যাণ করার ক্ষমতা বিস্ময়করভাবে বহুমুখী।

সর্বশেষে সঙ্ঘটি সম্পর্কে স্বামীজী যে-ধারণাটি দিলেন তা হল, শ্রীরামকৃষ্ণ স্থূলদেহ ত্যাগের পর এই সঙ্ঘরূপে বিরাজ করবেন চিরকাল। তাই এই সঙ্ঘের সেবা শ্রীরামকৃষ্ণেরই সেবা। এখানে গুরু দীক্ষাদানের মাধ্যমে শিষ্যকে সঙ্ঘরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করেন আর শিষ্যও গুরু ও সঙ্ঘের সেবার মাধ্যমে তাঁর অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছন। স্বামীজী এই সঙ্ঘের শীর্ষে শ্রীশ্রীমাকে বসালেন সঙ্ঘজননীরূপে। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি ও তাঁর চিরন্তন সেবিকাকে সঙ্ঘরূপী ঠাকুরের সেবায় লাগালেন। তিনিও যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাঁর মুখে উপযোগী

আহার জুগিয়ে তাঁর শরীরকে রক্ষা করতেন, ঠিক সেইভাবে ঠাকুরের এই সঙ্ঘশরীরকেও রক্ষা করতে লাগলেন। জগতের চোখে নিরক্ষর হলেও তিনি যে সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণঘোষিত সরস্বতী, তিনি তার প্রমাণ রেখেছেন বারবার। স্বামীজীর মঠের জমি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত, দুর্গাপূজায় বলিদানে 'রুধিরকর্দমম্' করে পূজার ইচ্ছা দূরদর্শিতার সঙ্গে নিবারণ করেছেন সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী। যদিও তিনি নিত্য কাজকর্মে কোনও নির্দেশ দিতেন না কিন্তু সঙ্ঘের আদর্শচ্যুতির সুদূর সম্ভাবনা দেখলেও সেখানে হস্তক্ষেপ করে সঙ্ঘকে রক্ষা করেছেন। আজও সঙ্ঘরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভাব বিকিরণ করছেন আর শ্রীশ্রীমা সূক্ষ্মদেহে সঙ্ঘকে রক্ষা করে চলেছেন। এই সঙ্ঘের সেবায় কত সাধু-ভক্ত যে বাঞ্ছিতফল লাভ করছেন তার ইয়ত্তা নেই। পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজীকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন সাধুর পক্ষে সঙ্ঘজীবনের কী দরকার। মহারাজ উত্তরে বলেন, ''ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর সঙ্ঘের দরকার নেই, কিন্তু তার আগে এর দরকার আছে, কারণ এর সুবিধে অনেক। এখানে একজনের তীব্র সাধন-ভজন দেখে অন্যেরা উদ্বুদ্ধ হয়, একজন কমজোরি সাধককে আর একজন হাত ধরে টেনে তুলতে পারে, একজনের প্রবল বৈরাগ্য অপরকে সংক্রামিত করে। বাপু, সারা পৃথিবী ঘুরে এসো এরকম সঙ্ঘ কোথাও পাবে না।''

বলা বাহুল্য, সঙ্ঘ বলতে শুধু রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন নয়, স্বামীজীর প্রথম সঙ্ঘ পরিকল্পনার 'মা ও তাঁর মেয়ে'দের মঠ অর্থাৎ শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনও অন্তর্ভুক্ত। দুটিরই গঠনের কারণ ও উদ্দেশ্য এক। ছেলে মানুষ করতে মা ও বাবা দুজনেরই প্রয়োজন, বরং শিশুর গড়ে ওঠার বয়সে মায়ের প্রয়োজন ও অবদান বেশি থাকে। সেইরকমই এই সমাজের গড়ে ওঠার প্রাথমিক অবস্থায় অর্ধশতাব্দী পরে এলেও শ্রীসারদা নামাঙ্কিত সঙ্ঘের দায় ও প্রভাব অনেক বেশি বলেই স্বামীজীর অভিমত ছিল। দুই সঙ্ঘেরই জননী শ্রীশ্রীমা। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক ও মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজী যেমন রামকৃষ্ণ মঠের প্রথম অধ্যক্ষ, সেইরকম শ্রীমায়ের সেবিকা ও মানসকন্যা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী সারদা মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষা। বৌদ্ধদের ছিল ত্রিশরণ—বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ; এযুগে স্বামীজী যেন শ্রীরামকৃষ্ণ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই তিনটিকে এক করে উক্ত সঙ্ঘ দুটিতে মিলিয়ে দিয়েছেন, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ধর্মরূপিণী শ্রীশ্রীমা সঙ্ঘেই একীভূত হয়ে আছেন। তাই এখন আমাদের উন্নতির পথে একটিই প্রতিজ্ঞা—সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

তথ্যসূত্র

১। শ্রীম-কথিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), অখণ্ড, পৃঃ ৪০৩ [এরপর, *কথামৃত*]

২। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), খণ্ড ১, পৃঃ ১৫০

৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০), পৃঃ ৮০ [এরপর, *পত্রাবলী*]

৪। *পত্রাবলী*, পৃঃ ১২১

৫। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১১) পৃঃ ৩৬

৬। তদেব, পৃঃ ৩৭

৭। তদেব, পৃঃ ৩৮

৮। *কথামৃত, পৃঃ* ৯২

৯। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২) পৃঃ ২১০

১০। *কথামৃত*, পৃঃ ৮০৮

১১। তদেব, পৃঃ ৯৩

১২। তদেব

১৩। স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০) ভাগ ২, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৩১